পঞ্চম অধ্যায়

পরিপাকতন্ত্র ও রক্ত সংবহনতন্ত্র

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাদের অধিকাংশই জটিল খাদ্য। এই জটিল খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের শরীর শোষণ করে সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জটিল, অদ্রবণীয় খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় দেহের গ্রহণ উপযোগী দ্রবণীয় সরল ও তরল খাদ্য উপাদানে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। যে তন্ত্র পরিপাকে অংশ নেয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বা পরিপাক তন্ত্র বলে।

প্রাণিদেহের যাবতীয় জৈবনিক কাজের ক্ষুদ্রতম একক হলো কোষ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি কোষের প্রয়োজন অক্সিজেন ও খাদ্য। বিপাকের ফলে কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বস্তু তৈরি হয় যেগুলো অপসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। রক্ত সংবহনতন্ত্র এই যোগাযোগের কাজটি করে থাকে।

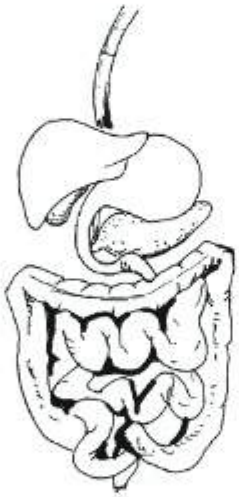

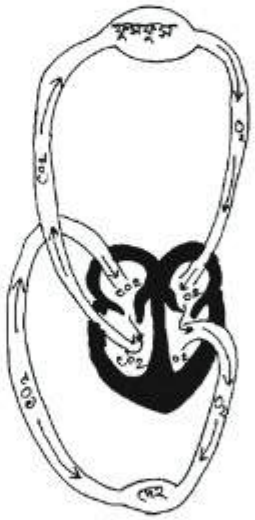

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের কারণ ও রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সকলকে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করব।
- পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

- রক্ত ও রক্তকণিকার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত সংবহনতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১ খাদ্য পরিপাক

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। আমরা কী কী খাদ্য খাই? খাদ্য কেন খাই? নিম্নের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা তা জানার চেষ্টা করি।

ক. আমাদের দেহে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ. প্রধান তিন শ্রেণির খাদ্যগুলো কী কী?

গ. কীভাবে তিন শ্রেণির খাদ্য আমাদের দেহের চাহিদা মেটায়?

ঘ. ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা কী?

ঙ. হজম হয় না এমন আঁশযুক্ত খাবারের প্রয়োজনীয়তা কী? কী ধরনের খাবারে এটা পাওয়া যায়?

তোমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনেছ ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে আমরা দেহে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে তা জানব। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাদ্য গিলে ফেলার পর আমরা খাদ্যকে আর দেখতে পাই না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই খাদ্য পরিপাক হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, যা দেহ শোষণ করে নেয়। হজম না হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো দেহ থেকে মলরূপে বের করে দেয়। দেহের ভিতর খাদ্যের যে পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুস্থ দেহে এ কাজটি আপনা-আপনি ঘটে। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ উচ্ছিষ্ট হিসেবে পায়ুপথে বের করে দেওয়া এটুকুই আমরা দেখছি। এই দুটি ঘটনার মাঝখানে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটছে?

যে সকল অঙ্গ খাদ্যের এই পরিবর্তন ঘটাতে অংশ নেয় তাদেরকে একত্রে পৌষ্টিকতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র বলা হয়। আমরা যে খাবার খাই তার পরিপাক আরম্ভ হয় মুখগহ্বরে। মুখগহ্বরের ভিতর খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে তা আমরা নিম্নের পরীক্ষণ দ্বারা নিজেরা করে দেখতে পারি।

কাজ: পরিক্ষণটি করার জন্য দুজন ছাত্র/ছাত্রী দরকার। তাদের একজনের মুখে টোস্ট বিস্কুট বা শুকনো রুটি (সেদ্ধ আলু বা ভাত) নিয়ে চিবাতে বলো। চিবানোর পর খাবারটুকু সরাসরি না গিলে কিছুক্ষণ মুখের ভিতর রেখে দিবে। অপর ছাত্রটি তা পর্যবেক্ষণ করবে। পরে দ্বিতীয় ছাত্রটিও নিজে এ কাজটি করবে। এবার প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয় ছাত্রটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। এবার তারা দুজনে মিলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

ক. খাবার চিবানোর সময় মুখগহ্বরের কোন কোন অংশ নড়েছিল?
খ. মুখের ভিতর বিস্কুট বা শুকনো রুটির টুকরোর কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল?
গ. চিবানোর পর খাদ্যটির স্বাদের কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল কি?
ঘ. রুটি বা বিস্কুটে কোন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে?
ঙ. খাদ্য গিলবার সময় তোমার দেহের কোন অংশটি নড়েছিল?
চ. খাদ্য গিলবার পর খাদ্য কোথায় যায়? কীভাবে যায়, লক্ষ কর।

নতুন শব্দ: পরিপাক ও খাদ্য উপাদান।

পাঠ ২ : লালা ও এনজাইম

তুমি খুব মিষ্টি পছন্দ কর। তোমার সামনে এক থালা রসগোল্লা রাখা হলো। তোমার মুখের ভিতর কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি ? তোমার মুখের ভিতর কোনো পানির মতো তরল পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করছ কি ? তোমার ডান হাতটি ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নাও। পরিষ্কার আঙ্গুল দিয়ে জিহ্বা থেকে কিছুটা তরল পদার্থ নাও। এর বর্ণ কেমন ?

উপরের পরীক্ষা থেকে যা জানলাম তা নিম্নের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নেই। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাবার মুখে নিয়ে আমরা তা দাঁত দিয়ে চিবুতে থাকি। জিহ্বা খাবারগুলোকে নেড়েচেড়ে দেয় যেন এগুলো ভাল করে চিবানো যায়। মুখের মধ্যে ঐ খাবারগুলো লালার সাথে মিশ্রিত হয়। লালা একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থ। মুখের পেছনে অবস্থিত লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়। খাদ্য পরিপাকে লালার বিশেষ ভূমিকা আছে। লালা খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করে ও গিলতে সাহায্য করে। লালায় এক ধরনের অনুঘটক বা এনজাইম থাকে। তোমরা হয়তো ভাবছো এনজাইম কী? এনজাইম হলো :

- এমন একটি বস্তু, যা খাদ্যবস্তুর সাথে মিশে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কিন্তু ক্রিয়া, বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত এনজাইম ভাল কাজ করে।
- নির্দিষ্ট এনজাইম নির্দিষ্ট কাজ করে। যেমন– ট্রিপসিন এনজাইম শুধুমাত্র আমিষের উপর ক্রিয়া করে।

লালার এনজাইম শ্বেতসারকে পরিবর্তন করে শর্করায় (মলটোজ) পরিণত করে। এ কারণে শর্করা জাতীয় খাবার চিবানোর পর কিছুক্ষণ মুখে রাখলে মিষ্টি লাগে। জিহ্বা আমাদের খাদ্যবস্তু গিলতে সাহায্য করে। মুখের শেষ প্রান্ত থেকে দুটি নল আমাদের দেহের ভিতরের দিকে নেমে গেছে। এদের একটি অন্ননালী ও অন্যটি শ্বাসনালি। শ্বাসনালির পেছনে নলের মতো অংশটিকে অন্ননালী বলে। এই নালি দিয়ে খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলিতে পৌছায়।

খাদ্য কীভাবে পাকস্থলিতে পৌছায়

নিজেরা কর

একটি রাবারের নল ও একটি মার্বেল নাও। খেয়াল রাখতে হবে, নলের পরিধির চেয়ে মার্বেলটি যেন বড়ো হয়। মার্বেলটিকে নলের ভিতর প্রবেশ করাও। এবার মার্বেলের পেছনদিক ঠেলতে থাক। ওটা নলের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকবে। এভাবে খাদ্য অন্ননালির ভিতর দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অন্ননালিতে আংটির মতো গোল পেশি রয়েছে। এই পেশিগুলো সংকোচন ও প্রসারণ করতে পারে। খাদ্যবস্তুর পেছনে অন্ননালির পেশি সংকুচিত হয় এবং সামনে অন্ননালির পেশি প্রসারিত হয়। অন্ননালির এরূপ সংকোচন ও প্রসারণকে ক্রমসংকোচন বা পেরিস্টালসিস বলে। এভাবে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যবস্তু ধীরে ধীরে পাকস্থলিতে পৌছায়।

নতুন শব্দ: ক্রমসংকোচন, অন্ননালি ও এনজাইম।

পাঠ ৩ – ৫ : পরিপাকতন্ত্র

আমরা আগেই জেনেছি জীবনধারণের জন্য চাই খাদ্য। আমরা জটিল খাদ্য খেয়ে থাকি। আমরা এও জেনেছি, জটিল খাদ্য দেহকোষ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। সেজন্য জটিল খাদ্যকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সরল, শোষণ উপযোগী ও পানিতে দ্রবীভূত করা প্রয়োজন। এ কাজকে খাদ্যের হজমক্রিয়া বা পরিপাক বলে। হজম কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় পৌষ্টিকনালি বা পরিপাকনালি এর সাথে রয়েছে কতগুলো জারক রস ও সাহায্যকারী এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থি।

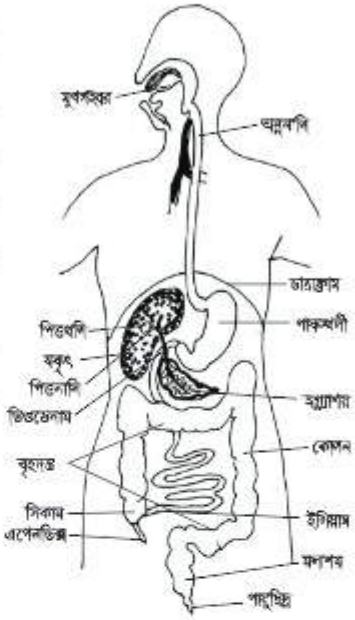

চিত্র- ৫.১ : পৌষ্টিকতন্ত্র

মুখছিদ্র, মুখগহ্বর, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র নিয়ে পৌষ্টিকনালি গঠিত। এছাড়া পৌষ্টিকনালির সাথে রয়েছে বিভিন্ন এনজাইম বা জারক রস নিঃসরণকারী তিন ধরনের গ্রন্থি যথা: লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় এবং যকৃৎ। এছাড়া পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরেও আছে আরও এনজাইম ও জারক রস নিঃসরণকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি।

আমাদের পরিপাকনালি বা পৌষ্টিকনালি মুখগহ্বর থেকে শুরু হয়ে মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নে এ তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. মুখছিদ্র : মুখছিদ্র থেকেই পরিপাকনালি শুরু। মুখছিদ্রের উপরে রয়েছে উপরের ঠোঁট এবং নিচে রয়েছে নিচের ঠোঁট। ঠোঁটদ্বয় খোলা ও বন্ধ থেকে খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছিদ্র পথেই খাদ্য পরিপাকনালিতে প্রবেশ করে।

২. মুখগহ্বর : মুখছিদ্রের পরেই মুখগহ্বরের অবস্থান। সামনে দাঁতসহ দুটি চোয়াল দ্বারা মুখগহ্বর বেষ্টিত। এর উপরে রয়েছে তালু এবং নিচের দিকে রয়েছে মাংসল জিহ্বা। এছাড়া দুই পাশে রয়েছে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি।

দাঁত খাদ্যবস্তু কেটে ছোটো ছোটো করে পেষণে সাহায্য করে। এসময় জিহ্বা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যবস্তুকে বার বার দাঁতের নিচে পাঠিয়ে চিবাতে সাহায্য করে। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং খাদ্যবস্তুকে গিলতে সাহায্য করে। লালা রসে এক ধরনের উৎসেচক বা এনজাইম আছে, যা শ্বেতসারকে আংশিক ভেঙে শর্করায় পরিণত করে। মানুষের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। প্রতি চোয়ালে ১৬টি করে থাকে । এসব দাঁত চার প্রকার। যথা–

চিত্র- ৫.২ : বিভিন্ন প্রকার দাঁত

I. কর্তন দাঁত খাবার ছোটো ছোটো করে কাটে।

II. ছেদন দাঁত দিয়ে মাংস ও অন্যান্য শক্ত জিনিস ছিঁড়ে ও কাটে।

III. অগ্রপেষণ দাঁত দিয়ে খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করা যায়।

IV. পেষণ দাঁতগুলো খাদ্যবস্তু চিবাতে ও পিষতে সাহায্য করে।

এ ছাড়া অন্যান্য দাঁতের অনেক পরে গজায় আক্কেল দাঁত বলে পরিচিতি পেষণ দাঁত।

৩. গলবিল : মুখগহ্বরের পরেই এর অবস্থান। এর মাধ্যমেই খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর থেকে অন্ননালি বা গ্রাসনালিতে যায়। গলবিলে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। তাই এখানে কোনো খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না।

৪. অন্ননালি : গলবিল ও পাকস্থলীর মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। খাদ্যবস্তু এর ভিতর দিয়ে গলবিল থেকে পাকস্থলিতে যায়।

৫. পাকস্থলি : অন্ননালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। গলবিল ও অন্ননালির ক্রমসংকোচনের ফলে পিচ্ছিল খাদ্যবস্তু এখানে এসে জমা হয়। পাকস্থলির আকৃতি থলির মতো। এর প্রাচীর বেশ পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলির প্রথম ও শেষ অংশে পেশিবলয় রয়েছে। পাকস্থলির প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নামে প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এখানে খাদ্য সাময়িক জমা থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পাচক রস পরিপাকে সাহায্য করে।

৬. ক্ষুদ্রান্ত্র : ক্ষুদ্রান্ত্র হলো পাকস্থলির পরবর্তী অংশ, এটা পরিপাকনালির সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা – (ক) ডিওডেনাম (খ) জেজুনাম ও (গ) ইলিয়াম।

(ক) ডিওডেনাম : এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ। পাকস্থলির পরের অংশ, দেখতে ঢ আকৃতির। পিত্তথলি থেকে পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নালির মাধ্যমে এখানে এসে খাদ্যের সাথে মিশে। এ রসগুলোও পরিপাকে অংশ নেয়। এখানে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থের পরিপাক ঘটে।

(খ) জেজুনাম : এটা ডিওডেনাম এবং ইলিয়ামের মাঝের অংশ।

(গ) ইলিয়াম : এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ। ইলিয়ামের ভিতরের প্রাচীরে শোষণ যন্ত্র থাকে। ব্যাপন পদ্ধতিতে শোষণকার্য সমাধার জন্য প্রাচীরগাত্রে আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। এদের ভিলাই (ভিলাস) বলে। হজমের পর খাদ্যের সারাংশ ভিলাসগাত্র দ্বারা রক্তে শোষিত হয়।

৭. বৃহদন্ত্র : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরেই বৃহদন্ত্রের শুরু। এটা ইলিয়ামের পর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি ভাল্‌ব বা কপাটিকা থাকে। লম্বায় এটা ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ছোট। কিন্তু ভিতরের ব্যাস ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের ব্যাস থেকে বড়ো থাকে। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা– (ক) সিকাম (খ) কোলন এবং (গ) মলাশয়। মলাশয় বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্ত। দেখতে কতকটা থলির মতো। খাদ্যের অপাচ্য বা অহজমকৃত অংশ এখানে মলরূপে জমা হয়।

৮.মলদ্বার বা পায়ু : এটি পরিপাকনালির শেষ প্রান্ত। এই প্রান্ত পথেই পরিপাক নালি দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাকগ্রন্থির কাজ

পরিপাকনালির যেসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদের পরিপাকগ্রন্থি বলে। তোমরা আগেই জেনেছ লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পরিপাক গ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত। লালাগ্রন্থি থেকে লালা ক্ষরণ হয়। লালায় এনজাইম ও পানি থাকে। পানি খাদ্যকে নরম করে। লালার এনজাইম হলো টায়ালিন।

যকৃৎ : দেহের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থি হলো যকৃৎ। যকৃৎ থেকে পিত্তরস তৈরি হয়। পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে। হজমের সময় পিত্তনালি দিয়ে পিত্তরস ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মিশে। পিত্তরস স্নেহ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

অগ্ন্যাশয় : বেশ কয়েকটি এনজাইম অগ্ন্যাশয়ে তৈরি হয়। এদের মধ্যে অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন এবং লাইপেজ অন্যতম। এরা ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন আমিষ খাদ্য, লাইপেজ স্নেহ খাদ্য এবং অ্যামাইলেজ শর্করা জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি: গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির ভিতরের প্রাচীরে থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম গ্যাস্ট্রিকরস বা পাচকরস।

আন্ত্রিক গ্রন্থি: ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাসে প্রচুর আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিকরস।

বৃহদন্ত্র : বৃহদন্ত্রে খাদ্য হজম হয় না। এখানে কোনো জারক রস বা এনজাইম তৈরি হয় না। বৃহদন্ত্র মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে। এ কাজটি অত্যন্ত দরকারি। এতে শরীর থেকে পানি বেশি পরিমাণে বের হওয়া রোধ করে। বৃহদান্ত্রে E coli নামক ব্যাকটেরিয়া আঁশ জাতীয় খাদ্যের গাঁজন ঘটায়।

বৃহদন্ত্রের সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ মলাশয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ মল হিসাবে সঞ্চিত হয়। প্রয়োজন মতো পরে পায়ু দিয়ে তা শরীরের বাইরে বর্জিত হয়।

নতুন শব্দ : পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ও গাঁজন।

পাঠ ৬ : সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

১. গ্যাস্ট্রাইটিস : সাধারণত বেশি মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খেলে, খাওয়ায় অনিয়ম করলে বুক জ্বালা আর অম্বল হয়। এতে পেটে বাড়তি এসিড তৈরি হয় আর তা থেকে পেট বা বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তি বা জ্বালার ভাব হয়। গলা ও পেট জ্বালা করে এবং পেটে ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মত এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে পাকস্থলি ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে। নিয়মিতভাবে কম মসলা ও কম তেলযুক্ত খাবার খাওয়া এবং সময়মত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

২. আমাশয় : আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। দুই ধরনের আমাশয় দেখা যায়। যথা–

(ক) অ্যামিবিক আমাশয়: প্রধানত এন্টামিবা নামে এক প্রকার এককোষী প্রাণী মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। এ রোগের উপসর্গগুলো হলো– তলপেটে ব্যথা, মলের সাথে রক্ত বা শ্লেষ্মা বের হওয়া। নলকূপের পানি বা ফুটানো পানি পান, পানি ও শাকসবজি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। মাছি, আরশোলা থেকে খাদ্যবস্তুকে রক্ষার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

(খ) ব্যাসিলারি আমাশয় : সিগেলা নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া অন্ত্রকে আক্রমণ করলে এ ধরনের আমাশয় হয়। জীবাণু বৃহদন্ত্রের ঝিল্লিকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা বের হয়। অনেক সময় এর সাথে রক্তও যায়। এজন্য এ রোগকে রক্ত আমাশয় বলে। এ রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩. কোষ্ঠকাঠিন্য : কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নয়। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। যেমন– পৌষ্টিকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন ধীর হওয়া, কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি না খাওয়া, পায়খানার বেগ পেলে সংঙ্গে সংঙ্গে পায়খানায় না বসা ইত্যাদি। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা, নিয়মিত শাকসবজি খাওয়া, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার খাওয়ার মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা যায়।

কাজ: শিক্ষার্থীরা খাতায় পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের নাম লিখবে। দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থী কী কারণে এ রোগগুলো হয় তা খাতায় লিপিবদ্ধ করবে। প্রতিটি দলের একজন করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। অন্যরা বিষয়গুলো মিলিয়ে নিবে।

পরিপাকতন্ত্রের যত্ন

১। **দাঁত:** প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা ও পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে থাকলে তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের ক্ষয় হয়। খুব বেশি মিষ্টি খেতে নেই। মিষ্টি দাঁত ক্ষয়ের জন্য দায়ী।

২। **খাদ্যবস্তু:** খাদ্যবস্তু পরিষ্কার ও সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। বাসি পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়। আঙুলের নখ ছোটো রাখা এবং খাওয়ার আগে থালাবাটি ও হাত অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৩। **খাওয়া:** নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া উচিত। একসাথে বেশি খাবার খাবে না। সব সময় সুষম খাবার খাবে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রচুর পানি খাবে। সব সময় পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খাবে। খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খাবে। অধিক মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়।

নতুন শব্দ : কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, ব্যাসিলারি আমাশয় ও অ্যামিবিক আমাশয়

পাঠ ৭–৮ : রক্তসংবহন তন্ত্র

যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে রক্ত পরিবহনের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে সংবহন প্রক্রিয়া বলে। রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং লসিকা ও লসিকাবাহী নালির সমন্বয়ে মানব দেহের সংবহনতন্ত্র গঠিত। যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তবাহী নালির সমন্বয়ে রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

রক্ত ও রক্তের উপাদান

তোমরা মুরগি, গরু অথবা ছাগল জবাই করতে দেখে থাকবে। জবাই করার সময় ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হয়। এই রক্তের রং কেমন? রক্ত কী ধরনের পদার্থ? রক্ত ঘন লাল রঙের একটি তরল পদার্থ। এটি এক ধরনের তরল যোজক টিস্যু। রক্তের স্বাদ ক্ষারধর্মী। রক্তের উপাদান দুইটি, যথা–

১। রক্তরস

২। রক্তকণিকা

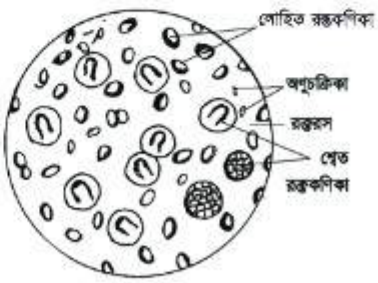

চিত্র- ৫.৩ : রক্তের উপাদান

১। **রক্তরস:** রক্তরস রক্তের তরল অংশ। সাধারণত রক্তের শতকরা ৫৫ ভাগ রক্তরস। এতে আমিষ, লবণ ও অন্ত্র থেকে শোষিত খাদ্য উপাদান থাকে। রক্তরসে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এতে ফাইব্রিনোজেন নামে একটি উপাদান থাকে যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

রক্তরস দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন, খাদ্যসার, হরমোন ইত্যাদি বহন করে।
দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ (যেমন–কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি) বহন করে বিভিন্ন রেচন অঙ্গের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়।

২। **রক্তকণিকা** : রক্তে তিন ধরনের কণিকা রয়েছে। যথা–

ক. লোহিত রক্তকণিকা
খ. শ্বেত রক্তকণিকা
গ. অণুচক্রিকা

ক. লোহিত রক্তকণিকা : লোহিত রক্তকণিকার জন্য রক্তের রং লাল দেখায়। এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায়। লোহিত রক্তকণিকা উভঅবতল (উভয় পৃষ্ঠে খাদ আছে)। চাকতির মতো গোলাকার কোষ। পরিণত লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। লোহিত রক্তকণিকা যকৃত ও অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়।

খ. শ্বেত রক্তকণিকা: শ্বেত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে কিছুটা বড়ো ও অনিয়মিত আকারের হয়। এদের নিউক্লিয়াস আছে। প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় এদের জন্ম। দেহে কোনো **রোগ–জীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেত রক্তকণিকা** সেগুলোকে ধ্বংস করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের প্রহরীর মতো কাজ করে। এদের সৈনিকের সাথে তুলনা করা হয়।

গ. অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মতো। এরা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে ছোটো হয় ও নিউক্লিয়াস থাকে না। এরা গুচ্ছাকারে থাকে। এদের উৎপত্তি লোহিত অস্থিমজ্জায়। দেহের কোনো অংশ কেটে রক্তপাত ঘটলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এদের প্লেটলেটও বলে।

রক্তের কাজ : রক্ত আমাদের দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। রক্ত দেহে নানা রকম কাজ করে। যথা–

১. **খাদ্য পরিবহন** : আমরা যে খাবার খাই, পরিপাকের পর এগুলো সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্ত সেই খাদ্যের সারাংশকে দেহের সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে দেহের কোষগুলোর পুষ্টি সাধন হয়।

২. **অক্সিজেন পরিবহন** : আমাদের দেহে সকল কাজের জন্য অক্সিজেন দরকার। অক্সিজেন না হলে জীবকোষ বাঁচতে পারে না। কাজেই খাবারের সাথে সাথে এদের দিতে হয় অক্সিজেন। রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপে প্রতিটি কোষে বহন করে।

৩. **কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন** : রক্তরস দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষগুলোতে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়।

৪. **বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন** : দেহে সৃষ্ট নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেওয়ার কাজে সহায়তা করে।

৫. রোগ প্রতিরোধ : দেহে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা সেগুলোকে মেরে ফেলে রোগ প্রতিরোধ করে।

৬. হরমোন পরিবহন : দেহের নালিহীন গ্রন্থিতে হরমোন উৎপন্ন হয়। রক্তের মাধ্যমে হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

৭. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ : রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশের তাপ পরিবহন করে। এতে দেহের সর্বত্র তাপমাত্রা ঠিক থাকে।

৮. রক্ত জমাট বাঁধা : দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে রক্তপাত হয়। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

নতুন শব্দ : লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা, রক্তরস, হরমোন ও নালিহীন গ্রন্থি।

পাঠ ৯–১০ : রক্তনালি

তোমার হাতের উপর দিক লক্ষ করলে দেখতে পারবে নীল রঙের এক ধরনের নালি দেখা যায়। এগুলো হলো শিরা। শিরা এক ধরনের রক্তনালি। রক্তনালি কী? যে নালির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে রক্তনালি বলে। আমাদের দেহে তিন ধরনের রক্তনালি আছে। যথা– ১. ধমনি ২. শিরা ও ৩. কৈশিকনালি।

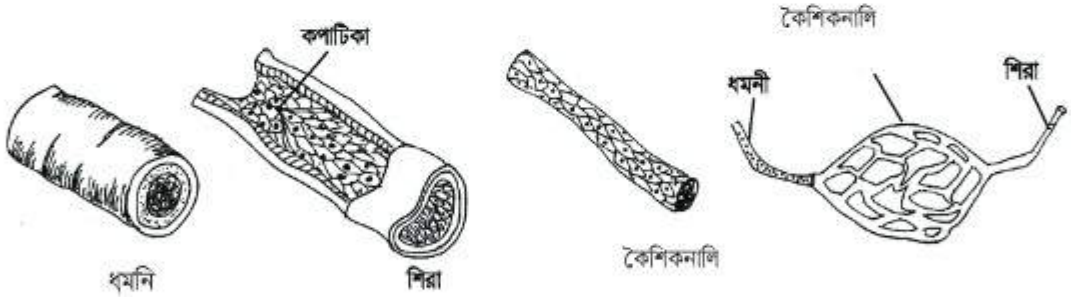

চিত্র-৫.৪ : ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি

১. ধমনি : যে সকল রক্তবাহী নালি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত বহন করে, তাকে ধমনী বলে। এরা দেহের ভিতর দিকে অবস্থিত। ধমনির প্রাচীর পুরু, গহ্বর ছোটো এবং এর গহ্বরে কপাটিকা থাকে না। ধমনি অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।

২. শিরা : যে সকল রক্তনালি দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে শিরা বলে। শিরা প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা। এদের গহ্বরটি বড়ো ও গহ্বরের প্রাচীরগাত্রে কপাটিকা থাকে। দেহের কৈশিক জালিকা থেকে শিরার উৎপত্তি ঘটে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শিরা সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত বহন করে।

৩. **কৈশিকনালি : ধমনি ক্রমান্বয়ে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত** অতিসূক্ষ্ম নালি তৈরি করে। এই সকল সূক্ষ্মনালিকে কৈশিকনালি বা কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিকনালি থেকে শিরার উৎপত্তি। এক স্তরবিশিষ্ট পাতলা এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে কৈশিকনালির প্রাচীর গঠিত। কৈশিকনালি দেহকোষের চারপাশে অবস্থান করে।

নিজেরা কর : তোমরা নিচের ছকটি পূরণ করে ধমনি ও শিরার পার্থক্য নির্ণয় কর।		
উৎপত্তি	**ধমনি**	**শিরা**
কপাটিকা		
গহ্বর		
প্রাচীর		
অক্সিজেনের পরিমাণ		
কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ		

হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি মোচাকৃতির অঙ্গ। এটা পেরিকার্ডিয়াম নামে দুই স্তরবিশিষ্ট একটি পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। হৃৎপেশি এক ধরনের স্বাধীন অনৈচ্ছিক পেশি, যা কারো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া নিজে নিজেই সংকোচন ও প্রসারণে সক্ষম। প্রতি মিনিটে কমবেশি ৭২ বার হৃৎপিণ্ড সংকোচিত ও প্রসারিত হয়। তুমি তোমার বুকের মাঝখানে হাত রাখ। একটা ধুকধুকানি বা কোনো স্পন্দন টের পাচ্ছ কী? কেন এমন ঘটে? হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এইরূপ ঘটে। এটা হৃদস্পন্দন।

নিজেরা কর : তুমি ঘড়ি দেখে তোমার বন্ধুর হৃদস্পন্দন গণনা কর।

হৃৎপিণ্ড তিন স্তরে গঠিত। যথা– ক. বাইরের স্তর বা এপিকার্ডিয়াম খ. মাঝের স্তর বা মায়োকার্ডিয়াম এবং গ. ভিতরের স্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম। এদের মধ্যে মায়োকার্ডিয়ামই সবচেয়ে পুরু এবং এর সংকোচনের কারণে হৃৎপিণ্ড পাম্প করে রক্ত সঞ্চালন করে।

হৃৎপিণ্ড একটি চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ফাঁপা অঙ্গ। হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠ দুটির নাম ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটি যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয়। অলিন্দে প্রাচীর পাতলা ও নিলয়ের প্রাচীর পুরু থাকে। বাম নিলয়ের প্রাচীর অধিকতর পরু থাকে। অলিন্দ ও নিলয় দুটি আলাদা প্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকে। আয়তনে অলিন্দগুলো নিলয়ের চেয়ে আকারে ছোটো হয়।

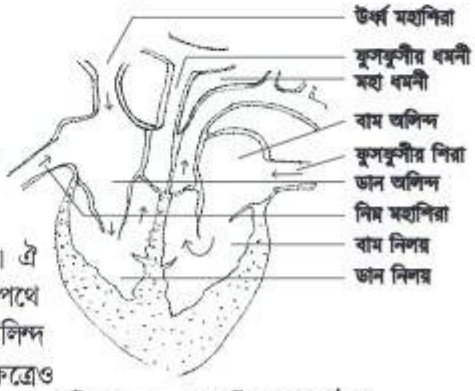

চিত্র-৫.৫ : হৃৎপিণ্ডের গঠন

ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রপথে তিন কপাট বিশিষ্ট কপাটিকা থাকে। রক্ত এ ছিদ্রপথে অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে বাম অলিন্দ ও নিলয়ের দুই কপাট বিশিষ্ট মাঝে কপাটিকা থাকে। এক্ষেত্রেও বাম অলিন্দ থেকে রক্ত কেবল মাত্র

নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া মহাধমনি ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে ও ফুসফুসীয় ধমনি এবং ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা রয়েছে। এ কপাটিকাগুলো রক্তের গতিপথ একদিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নিজেরা কর : একদিন রফিকের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রফিকের বড়ো ভাই একজন ডাক্তার। ভাইয়া বাবার হাতের কবজির উপর হাত রেখে হাত ঘড়ি দেখছিলেন। রফিক বিষয়টি লক্ষ করল। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভাইয়ার কাছে জানতে চাইল বাবার কবজির উপর হাত রেখে তিনি কী পরীক্ষা করছিলেন। হাতের উপরের দিকে যে রক্তনালিগুলি দেখা যায় ওগুলোকে কী বলে? ভাইয়া তার প্রশ্নের জবাবে বললেন, তিনি বাবার নাড়ির স্পন্দন দেখছিলেন। নাড়ি স্পন্দন কী? হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ধমনির মধ্যে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় তাকে নাড়ি স্পন্দন বলে। ধমনি থাকে দেহের ভিতরে আর শিরা থাকে দেহের উপরিভাগে।

এবার তুমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। তার হাতের শিরাগুলো পর্যবেক্ষণ কর। তোমার বন্ধু তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করবে। এবার তুমি স্কুলের মাঠে পাঁচ মিনিট দৌড়ে আস। তুমি তোমার বন্ধুকে তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে বলো। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন–প্রসারণ বেড়ে যায় ফলে নাড়ির স্পন্দনও বৃদ্ধি পায়।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন

হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। যখন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন হয় তখন হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনি পথে বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। আবার হৃৎপিণ্ডে যখন প্রসারণ ঘটে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত শিরা পথে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এভাবে হৃৎপিণ্ডর সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা রক্ত একবার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে আবার হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয়।

নতুন শব্দ: কপাটিকা, ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি, অলিন্দ ও নিলয়

পাঠ ১১–১২ : হৃদরোগ

নোবেল সাহেব একজন ব্যাংক কর্মচারী। তিনি একজন মাঝারি গড়নের মোটাসোটা মানুষ। তিনি মাছ–মাংস ও তেলযুক্ত খাবার খেতে খুব পছন্দ করেন। তিনি একজন ধূমপায়ী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করেন। পরিশ্রমের সাথে মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করেন। সারা দিন হাঁটাচলা, ব্যায়াম হয় না বললেই চলে। হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে বুকের বাম দিকে ব্যথা অনুভব করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা তীব্র হলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন যে, নোবেল সাহেব হৃদরোগে ভুগছেন। এবার বলতো হৃদরোগের কারণগুলো কী কী?

হৃদরোগের কারণ

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা হৃদরোগের যে কারণগুলো জানতে পারলাম তা হলো:

- অধিক তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ।

- সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা।
- ধূমপান করা।
- অতিরিক্ত পরিশ্রম করা।
- খেলা, হাঁটাচলা, ব্যায়াম বা কোনো রকম শারীরিক পরিশ্রম না করা।

হৃদরোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

১। অধিক শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া।

২। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা। যথা– খেলাধুলা, হাঁটাচলা, ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩। নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

৪। ধূমপান ত্যাগ করা। ধূমপানের ফলে ধমনিগাত্র শক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।

৫। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার চেষ্টা করা।

৬। তাজা ফলমূল, শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৭। দেহের ওজন বাড়তে না দেওয়া। দেহের ওজন বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের উপর রক্ত সঞ্চালনের চাপ পড়ে। ফলে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

নিজেরা কর : হৃৎপিণ্ডের চিত্র অঙ্কনকর। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতিপথ চিহ্নিত কর। কীভাবে হৃদরোগ রোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় এমন একটি চার্ট তৈরি কর।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

ধমনি : ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের সকল অঙ্গে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় ধমনি কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে নিয়ে যায়।

শিরা: শিরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়ে সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় শিরা এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় শিরাপথে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে নিয়ে আসে।

লোহিত কণিকা : লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে।

অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

অনুশলনী

শূন্যস্থান পুরণ কর।

১. এনজাইম ———————— সাহায্য করে।

২. ———————— জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামাইনো অসিডে পরিণত হয়।

৩. লোহিতকণিকায় ———————— নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে।

৪. ———— রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৫. ———— কণিকা দেহে প্রহরীর মতো কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিপাক হওয়া খাদ্য কোথায়, কীভাবে, শোষিত হয়?

২. দাঁত পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৩. মুখ দিয়ে পাকস্থলিতে কীভাবে খাদ্য যায় বর্ণনা কর।

৪. তোমার দেহে রক্তকণিকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৫. রক্তনালি আমাদের দেহে কী কাজ করে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেহের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থি কোনটি?

ক. অগ্ন্যাশয়
খ. আন্ত্রিক গ্রন্থি
গ. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি
ঘ. যকৃৎ

২. লালায় থাকে কোনটি?

ক. টায়ালিন ও পানি খ. ট্রিপসিন ও পানি
গ. লাইপেজ ও পানি ঘ. অ্যামাইলেজ ও পানি

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

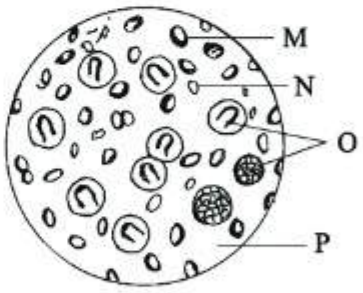

৩. নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত থাকে–

i. M, N ii. N, O iii. O, M

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৪. P চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে–

i. খাদ্যসার বহন করা ii. প্রহরী হিসেবে কাজ করা iii. বর্জ্য নির্গমনে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. কোনটি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?

ক. M খ. N গ. O ঘ. P

সৃজনশীল প্রশ্ন

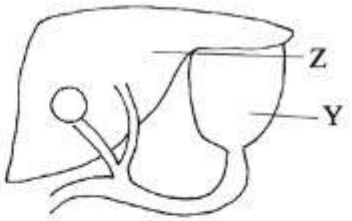

১।

ক. ভিলাই কী?

খ. খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. Y চিহ্নিত অংশটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Z অংশটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে মানবদেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে? ব্যাখ্যা কর।

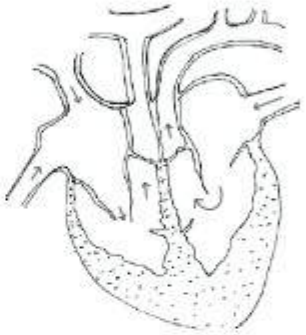

২।

ক. পেরিকার্ডিয়াম কী?

খ. লাইপেজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে তীর চিহ্নিত পথে কীভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গটি সুস্থ রাখার জন্য আমাদের কেন সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত, তা যুক্তিসহ লিখ।

নিজেরা কর

১. তুমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন কীভাবে পরীক্ষা করবে? ব্যায়াম করার পর তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছো কি? পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. তোমরা দলগতভাবে মানব পরিপাকতন্ত্রের একটি চার্ট তৈরি কর এবং প্রতিটি অঙ্গের পাশে এর কাজ লিপিবদ্ধ কর।